

জেন্ডার ধারণা ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

কাজী হাসান ইমাম*

Abstract : The gender issues in Bangladesh are considered to be a chronic problem of our patriarchal society. Despite several positive interventions undertaken by the Government over the last three decades, the position of women in the society did not improve at a satisfactory level. The present study mainly focussed on the conceptual issues and situation analysis with particular reference to some identified specific aspects of universally accepted gender issues. Gender issues bear socio-economic, cultural and political connotations. Therefore, these should be handled socially, economically, culturally, legally and politically. The key social change agents responsible for policy formulation, programme planning and their implementation should have gender-friendly attitudes in actualizing gender parity, equity and equality. Basically, the problems mostly lie in the grass root levels, where lack of education is very high; religious superstitions are still deep-rooted in every pore of the society; cultural believes have been integrated into life styles and poverty has stricken the doorsteps of people. There is a need for undertaking effective motivation and conscientization strategies by owning the problems at all levels, in the family, community, society and nation.

১.০ ভূমিকা

নারীর কোন আত্মপরিচয় নেই! সে কখনো কারো মা, কারো বোন, কারো কন্যা, কখনো বা কারো স্ত্রী ইত্যাদি—পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বাস্তবত এটাই হচ্ছে নারীর তথাকথিত সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান (Status)। ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘকাল সারা বিশ্বে এটিই ছিল নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের বাস্তব চিত্র। কালের অবধারিত প্রবাহে আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারায় এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশে সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। জনসংখ্যার বর্ধিষ্ণু প্রবৃদ্ধি ও ভূমি-মানুষের প্রতিকূল অনুপাত মানুষের জীবন-যাপন প্রণালীকে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিজের অধিকার, ক্ষমতা ও উন্নয়ন সম্পর্কে আগের তুলনায় অধিকতর সচেতন ও আত্ম-প্রত্যয়ী করে তুলছে। অন্যদিকে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমশ অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে। ফলে নারীর "কুলবধূ"-চিত্রটি ধীরে ধীরে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে, বেঁচে থাকার তাগিদে অথবা

* উপ-পরিচালক; বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

১ "কুলবধূ"-র ধারণাটি মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লালিত একটি মৌলবাদী চেতনায় প্রকাশ, যেখানে আবরোধিত গৃহ-জীবনই নারীর অবধারিত ও অনিবার্য পরিণতি এবং সেটাই তাদের জন্য সবচেয়ে সম্মানের বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে প্রগতিশীল সমাজের দৃষ্টিকোণে নারীর নিজস্ব সত্তা-বিকাশে "কুলবধূ"-র ধারণাটিই প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত এবং বঞ্চনার গুরু মূলত এখান থেকেই।

অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন ব্যবস্থার তাড়নায় উন্নয়নে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ছে। আর তাই নারীর কথিত "কোমল হাত"^২ ক্রমশ জীবন সংগ্রামের বলিষ্ঠ হাতিয়ারে রূপান্তরিত হচ্ছে। মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানগত এ পরিবর্তন পৃথিবীর সব দেশে এবং সব কালে একই হারে ঘটেনি। তবু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে সারা বিশ্বে পরিবর্তিত হয়েছে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই এখনো নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি।

দীর্ঘ-দশক উন্নয়ন প্রয়াসের পর পেশাজীবীরা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, শুধু সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণেই যে উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা অত্যাাবশ্যক তা-ই নয়, দারিদ্র বিমোচনেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা-বিশ্লেষণের আলোকে বিশ্বব্যাংকের "Enhancing Women's Participation in Economic Development" শীর্ষক নীতিপত্র অভিমত পোষণ করেছে যে, নারীর অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকার সমর্থন প্রকারান্ত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে, শিশুর অব্যাহত অস্তিত্ব (child survival) এবং সামগ্রিকভাবে পারিবারিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটায়, জন্মহার হ্রাস করে এবং ফলত তা জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হ্রাসে সহায়তা করে^৩। এই জ্ঞাত প্রত্যর্পণ (known returns) সত্ত্বেও উন্নয়নে অবদান রাখা ও উন্নয়নের সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলারা নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধাগুলো শুরু হয় মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে তুলনামূলক নিম্ন বিনিয়োগ দিয়ে এবং তা অব্যাহত থাকে সম্পদ ও সেবার ক্ষেত্রে তাদের সীমিত প্রবেশাধিকারের (access) মাধ্যমে। আর মহিলাদের সুযোগ গ্রহণের ওপর আরোপিত আইন ও প্রথাগত বিধি-নিষেধ এবং অনুশীলন এ অবস্থাকে আরো নাজুক করে তোলে। ফলে বিগত কয়েক দশকের উন্নয়ন অগ্রগতি আনুপাতিক হারে মহিলাদের জন্য প্রত্যাশিত সুবিধা বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি^৪। অধিকতর সমতাভিত্তিক^৫ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, বিশেষত

২ "কোমল হাত" কথাটি নিঃসন্দেহে শ্রুতি মধুর, কিন্তু সম্মানের নয়। আর এটি হচ্ছে সমাজ-সৃষ্ট এক সুদূর প্রসারী জেভার বিভেদ— শ্রম বিভাজিত এ সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে পচাংপদ করে রাখার এক অনন্য কৌশল।

৩ The World Bank (1994): *Enhancing Women's Participation in Economic Development*. A World Bank Policy Paper, Washington D. C., p. 7.

৪ *ibid*, p. 10.

৫ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে সমতার নীতি অবৈষম্যমূলক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমতার নীতির বাস্তব প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে নারী বা অন্যান্য পচাদপদ সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। সমতার নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, যে কোন উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের শারীরিক ভিন্নতার কারণে দৃষ্টিগ্রাহ্য অথবা সামাজিকভাবে জেভার বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ অতিক্রম করা—নারী-পুরুষের শারীরিক ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করা নয়।

নারীর সমতায়ন^৬ ব্যাহত হচ্ছে মূলত রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার কারণে^৭।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক অঞ্চলে খাদ্যোৎপাদনের অর্ধাংশই মহিলারা নিশ্চিত করে, পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার দায়িত্বের প্রায় পুরোটাই তাদের ওপর বর্তায় এবং শিল্প শ্রমিকের এক-চতুর্থাংশ ও সেবা সেক্টরের এক-তৃতীয়াংশ শ্রমের যোগান দেয় মহিলারা। আয়-উপার্জনকারী কার্যক্রম ছাড়াও মহিলাদের গৃহস্থালি কাজের মধ্যে রয়েছে অসুস্থের সেবা করা, গৃহস্থালির রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুর প্রতিপালন, খাদ্য তৈরি এবং খাবার পানি ও জ্বালানী সংগ্রহ। তা সত্ত্বেও শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগের প্রতি নারীর সীমিত প্রবেশাধিকারের কারণে তাদের উৎপাদনশীলতা তাদের স্থৈতিক (potentials) সামর্থ্যের তুলনায় অনেক নীচে থাকছে।

সরকারি চাকুরিতে মহিলাদের বর্ধিষ্ণু অংশগ্রহণ এবং অর্থনীতিতে তাদের অবদানের স্বীকৃতি সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ এখন উত্তম আলোচনার বিষয়। নারীর ক্ষমতায়ন অর্থ হলো তাদের আত্ম-নির্ভরশীলতা এবং সামাজিক মুক্তি। কর্মক্ষেত্রে নারীর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা থাকা অপরিহার্য এবং নারীর ক্ষমতায়নে কর্মক্ষেত্রে তাদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস নেয়া অত্যাবশ্যক। এগুলো নিশ্চিত করা সম্ভব হলে তার "চেইন রি-অ্যাকশন" শ্রমবাজারে অধিক সংখ্যক নারীর উপস্থিতিতে উদ্বুদ্ধ করবে, কর্মক্ষেত্রে তাদের সরব উপস্থিতি নিশ্চিত করবে এবং ক্রমশ তারা নিজেরাই নিজেদের অধিকার অর্জনে সক্ষম হবে। কিন্তু সরকারি চাকুরিতে নারী-পুরুষের বিদ্যমান হার খুবই বৈষম্যমূলক। মূলত সরকারি চাকুরিতে মহিলাদের নগণ্য উপস্থিতি কর্মক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ধারণার প্রতি সামাজিক উদাসীনতার নির্দেশক। বিদ্যমান পদ্ধতি সরকারের অবনমিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। মহিলারা তাদের নিজস্ব অধিকার ও মেধা বলে উচ্চাসনে আসীন হওয়ার ব্যাপারেও এক ধরনের অগ্রহণযোগ্যতার মনোভাব বিরাজ করে। তবে এ কথা স্মর্তব্য যে, বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য হলেও আজকের পৃষ্ঠপোষকতা মহিলাদের মধ্যে সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষ পুরুষের তুলনায় ভাল করার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সৃষ্টির প্রেরণা যোগাবে। যাহোক, প্রথম পর্যায়ে এটার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া

৬ সমতায়নের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাগণ নারী-পুরুষের শারীরিক ও সামাজিক অবস্থাগত ভিন্নতাকে বিবেচনায় নিলেও তারা মূলত নারীকে দুর্বল ও অনুপোষিত হিসেবে চিহ্নিত করে এবং উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ না করে (যেমন সমাজ-সংস্কার বা নারীর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ সুবিধা সংরক্ষণ) বরং নারীকে বৈষম্যের দিকে ঢেলে দেয় (যেমন রাজিকালীন কাজে নারীর পরিবর্তে অধিকহারে পুরুষদের নিয়োগ করা, এখানে নারী কর্ম-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়)। সমতার নীতি মূলত নারীর প্রতি সমান আচরণ নয়, নারীর জন্য সমান প্রবেশিকারের (access) এবং সমান ফলাফলের (result) ওপর গুরুত্ব দেয়।

৭ Sen, Gita et. al. Ed. (1994): *Population Policies Reconsidered : Health, Empowerment and Rights*. Harvard Series on Population and International Health. HCPDS & IWHC, New York, p. 28.

অত্যাৱশ্যক যে, মহিলারা সরকারে কাজ করতে পারে এবং ভাল করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে বিদ্যমান এবং বর্ণিত মনস্তাত্ত্বিক বাধাগুলোর উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হলে ভৌত পরিবেশ উন্নয়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিশ্চিত হবে।

২.০ জেভার : সংজ্ঞা ও ধারণা

জেভার (Gender) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে লিঙ্গ বা সেক্স। জেভারের আভিধানিক এই অর্থ মূলত প্রকৃতি প্রদত্ত লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সাহিত্যে জেভার শব্দটি ভিন্ন ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেভার এবং সেক্স শব্দ দু'টির মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য টানা হচ্ছে। প্রখ্যাত নারী-প্রবক্তা কমলা ভাসিন এ শব্দ দু'টিকে একটি সহজবোধ্য উদাহরণে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভাষায়, "প্রকৃতি ছেলে ও মেয়ে তৈরি করে, সমাজ তাকে নারী ও পুরুষে পরিণত করে"। অর্থাৎ প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট ছেলে ও মেয়ে বৈষম্যমূলক সামাজিক অনুশাসনে একদিন নারী ও পুরুষে পরিণত হয় এবং একদিন তারা দু'টি ভিন্ন জগতের বাসিন্দা হিসেবে পরিগণিত হয়। আর সমাজ সৃষ্ট এই বিভেদের কারণেই পুরুষ উত্তম ও নারী অধম হিসেবে বিবেচিত এবং সেভাবেই আমাদের সমাজ সমাজে নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে এটা সুস্পষ্ট যে, আভিধানিকভাবে সেক্স বা জেভার শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক বা শারীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য, যা অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতিগত দিক থেকে নারীর শারীরবৃত্তীয় আরো আলাদা বৈশিষ্ট্য হলো, নারী সন্তান ধারণে এবং শিশুকে নিজস্ব স্তন্য-দুগ্ধপান করাতে সক্ষম। কিন্তু পুরুষ তা নয়। এমন কি পুরুষের শারীরবৃত্তীয় এমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই, যা তাকে উত্তমের আসনে আসীন করতে পারে। এক্ষেত্রে নারী অগ্রগণ্য। আর এ কারণে ঐশী গ্রন্থাবলীতে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধিকতর মর্যাদার আসনে আসীন করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এটাই হচ্ছে নারীর নিরপেক্ষ অবস্থান (Status)। কিন্তু জেভার শব্দটি মূলত একটি ভিন্নতর অর্থ বহন করে। এই ভিন্নতর অর্থে জেভার শব্দটি প্রথমে মনোবিজ্ঞানীরা এবং পরবর্তীতে নারী প্রবক্তারা ব্যবহার শুরু করেন। উন্নয়ন সাহিত্যে জেভার শব্দটি এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। মূলত জেভার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী-পুরুষের অবস্থান বা ভূমিকা, যা পরিবর্তনীয়। জেভার নির্দেশ করে একজন নবজাতক মেয়ে শিশু ও একজন ছেলে

শিশু কিভাবে সামাজিকভাবে যথাক্রমে একজন নারী ও একজন পুরুষে পরিণত হয়। সামাজিক বৈষম্যের যাঁতাকলে সৃষ্ট সামাজিক নারী ও সামাজিক পুরুষের পার্থক্য আমরা দেখতে পাই তাদের স্ব-স্ব ভূমিকায়, দায়িত্বে ও কর্তব্যে, আচার-আচরণে এবং পরিচিতিতে। আবার এ সকল বিষয়সমূহ নির্ধারণ করে সম্পদের বণ্টন, সুযোগ-সুবিধা এবং ভোগের অধিকার। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট লিঙ্গ বা সেক্স এবং সামাজিকভাবে সৃষ্ট লিঙ্গ বা জেন্ডার-এর মধ্যে যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান তার একটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আভিধানিক লিঙ্গ বা সেক্স		আভিধানিক লিঙ্গ বা সেক্স	
নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
ক. প্রাথমিক পার্থক্য * যৌন অঙ্গসমূহ * প্রজনন অঙ্গ * স্তন * ঋতুচক্র	ক. প্রাথমিক পার্থক্য * যৌন অঙ্গসমূহ * প্রজনন অঙ্গ * গোঁফ, দাড়ি	* পুরুষের চেয়ে হীন, দুর্বল ও অক্ষম। * নারী কোমল স্বভাবের। * নারী কেবল গৃহে আবদ্ধ থেকে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন করে। * সন্তান লালন-পালন ও পরিবারের অন্যান্যের সেবা করা নারীর কর্তব্য ইত্যাদি।	* নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবল ও সক্ষম। * পুরুষ কঠোর স্বভাবের। * পুরুষেরা বাইরে আয়-উপার্জন করে। * পুরুষেরা রাষ্ট্র, সমাজ পরিচালনা করবে, রাজনীতি ও দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাবে ইত্যাদি।
খ. মাধ্যমিক পার্থক্য * গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব। * সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ প্রদান।	খ. মাধ্যমিক পার্থক্য * গ্রহণযোগ্য লিঙ্গীয় কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই।	* নারী-পুরুষের এ সম্পর্ক ও এ সম্পর্কিত ধারণা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বৈজ্ঞানিকভাবে তা আদৌ সত্য নয়।	

প্রকৃতির সৃষ্টি নারী-পুরুষের মধ্যে নারীর অবস্থান অত্যন্ত সম্মানের। প্রকৃতি নারীকে যে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে, পুরুষের দ্বারা তা অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নির্যাতন আর বৈষম্যের শিকার হয়ে সামাজিক দৃষ্টিকোণে নারী পরিণত হয়েছে "হরিজনে"। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ বিচারে বলা যায় যে, লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা শারীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ণীত নারী-পুরুষের ভিন্নতা, যা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে সৃষ্ট নারী-পুরুষের সম্পর্ক বা ভিন্নতা, যা সমাজ কর্তৃক আরোপিত এবং সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তনীয়। অন্য কথায়, সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থানের গুণগত ও পরস্পর নির্ভরশীল চরিত্রকে প্রকাশ করে জেন্ডার।

উন্নয়ন সাহিত্যে জেন্ডার আলোচনা এখন সারা বিশ্বেই একটি উল্লেখযোগ্য আসন দখল করে আছে। উন্নয়নে নারী, নারী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বহুল আলোচিত বিষয়। "নারী উন্নয়ন"-কে কোন প্রান্তিক বা বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করার অবকাশ নেই। এজন্য নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে হবে। নারীকে মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে হলে জেন্ডার চাহিদা ও উন্নয়নে নারীর ভূমিকা সঠিকভাবে নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন।

৯ ভাসিন, কমলা ও খান, নিঘাত সাইদ (২০০২) : নারীবাদ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এর প্রাসঙ্গিকতা, (অনুবাদ : ফওজিয়া খোন্দকার ইভা), প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭।

চাহিদা বলতে আমরা সাধারণত মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের প্রয়োজনীয়তাকে বুঝি। এগুলো মানুষের স্বাভাবিক বা মৌলিক চাহিদা। কিন্তু এই স্বাভাবিক চাহিদা আর জেভার চাহিদার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তারতম্য থাকলেও বিশ্বব্যাপী নারী এখনো পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ। আর তাই জেভার চাহিদা বলতে নারীর চাহিদাকে নির্দেশ করা হয়। মূলত জেভার চাহিদার অর্থ হলো নারী-পুরুষ ভেদে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর চাহিদা। নারীর এই পশ্চাৎপদতার কারণ মূলত দু'টি। প্রথমত সমাজের প্রচলিত জেভার-শ্রমবিভাগের কারণে নারীকে তিন ধরনের ভূমিকা পালন করতে হয়। এগুলো হচ্ছেঃ (১) পুনরুৎপাদনমূলক—যেমন, সন্তান জন্মদান, তাদের লালন-পালন, রান্না-ধোয়া-মোছা, ঘর-দোর পরিস্কার করা, পানি ও জ্বালানী সংগ্রহ এবং সেবা-যত্নসহ গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ; (২) উৎপাদনমূলক—সমাজে যে সকল কাজের নগদ বিনিময় মূল্য আছে, অর্থাৎ যে সকল কাজের মাধ্যমে আয় উপার্জন করা যায় এবং (৩) সামাজিক ভূমিকা—যে সকল কাজ কোন বিনিময় মূল্য ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয়। সামাজিক ভূমিকা আবার (ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা ও (খ) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা এ দু'ভাবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রথমটি সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের ব্যবস্থাপনাগত ভূমিকাকে নির্দেশ করে।

নারীর এই ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সমাজের প্রচলিত শ্রম-বিভাজনে নারীকে মূলত পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকার দিকে ঠেলে দেয়া হয়। প্রচলিত জেভার শ্রম-বিভাজনের ফলে নারীর দৈনন্দিন কাজ, শ্রম-দিবসের মেয়াদ, দায়িত্ব ও জীবন-যাপন প্রণালী পুরুষ থেকে ভিন্নতর হয়। দ্বিতীয়ত সমাজে সুযোগ-সুবিধা, অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিজস্ব পছন্দ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাজে বিদ্যমান অসমতা থেকেই জেভার চাহিদার উদ্ভব। এ সকল বিষয় বিবেচনায় জেভার চাহিদাকে (ক) বাস্তবমুখী জেভার চাহিদা ও (খ) কৌশলগত জেভার চাহিদা এ দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখা হয়। বাস্তবমুখী জেভার চাহিদা হলো নারীর প্রাত্যহিক জীবন-যাপন ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাকে বাস্তবত যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তার উত্তোরণের জন্য উদ্ভূত চাহিদা। সমাজের প্রচলিত শ্রম-বিভাজনে নারীকে ইতোপূর্বে বর্ণিত যে তিন ধরনের ভূমিকা পালন করতে হয়, সে সকল ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত চাহিদাই বাস্তবমুখী জেভার চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। এ সকল চাহিদা পরিপূরিত হলে নারীর জীবন-যাত্রার মানের কিছুটা উন্নয়ন ঘটে, তার প্রাত্যহিক কাজের বোঝা কিছুটা লাঘব হয় এবং সে আরো সুষ্ঠুভাবে নিজস্ব ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়। অন্যদিকে সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর অধস্তন অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন থেকে নারীর কৌশলগত জেভার চাহিদার উদ্ভব। কৌশলগত জেভার চাহিদা মূলত সমাজে নারীর

জেভার ভূমিকা পরিবর্তনে সচেতন। এ চাহিদা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর হীন অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অবস্থানগত সমতা বিধানের প্রয়াস নেয়। কৌশলগত জেভার চাহিদা পূরণ বাস্তবত কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। এ চাহিদা প্রচলিত জেভার শ্রম-বিভাজনের পরিবর্তন, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, আইনগত অধিকার অর্জন, অবৈষম্যমূলক মঞ্জুরী প্রাপ্তি, সম্পদের মালিকানা ও নিজ আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ, নিজ দেহ ও প্রজননের ওপর আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার এবং যে কোন ধরনের বৈষম্য থেকে মুক্তিলাভ ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এ সকল চাহিদা একবার অর্জিত হলে তা চেতনাগত শক্তিতে রূপলাভ করে, ফলে তা আর প্রত্যাহার করা সম্ভব হয় না। সুস্পষ্ট বিশ্লেষণের প্রয়োজনে নিম্নে বাস্তবমুখী জেভার চাহিদা ও কৌশলগত জেভার চাহিদার পার্থক্য নিরূপিত হলো :

বাস্তবমুখী জেভার চাহিদা	কৌশলগত জেভার চাহিদা
* বিদ্যমান জেভার ভূমিকা পালনে সহায়তা করে অর্থাৎ জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন কবে, প্রাত্যহিক কাজের বোঝা লাঘব করে এবং অধিকতর ফলপ্রসূভাবে নিজস্ব ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে। * তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয়, স্বল্পমেয়াদী ও অবিলম্বে পূরণীয়। * নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটভিত্তিক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নারীর জন্য বিভিন্ন রকম। * দৈনন্দিন চাহিদার সাথে সম্পর্কিত। যেমন খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জ্বালানী, পানীয় জল, নিরাপদ মাতৃত্ব ইত্যাদি। * নারীদের পক্ষে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। * নারীদের উপকারভোগী হিসেবে দেখা হয়। * নারীর অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়। * নারীর প্রচলিত জেভার ভূমিকা বা সমাজে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন করে না। * নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের (জেভার) উন্নয়ন ঘটায় না। * প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা যোগানের মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। যেমন খাদ্য ও পুষ্টি সাহায্য, নলকূপ ও স্যানিটারী পায়খানা স্থাপন, উন্নত চুলা সরবরাহ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ইত্যাদি। * এ চাহিদা পূরণের উপায় ও উপকরণ বা শর্তাবলী প্রত্যাহার করা হলে নারীর অবস্থা আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসে।	* বিদ্যমান জেভার ভূমিকা পরিবর্তন করে এবং নারীর মর্যাদা, অধিকার, নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা, পছন্দ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। * দীর্ঘ-মেয়াদী, অবিলম্বে পূরণযোগ্য নয় বা পূরণ করা দুরূহ। * সকল নারীর ক্ষেত্রে সাধারণত একই ধরনের। * প্রতিকূল অবস্থা বা অধস্তন অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত। যেমন নারীর মর্যাদা, অধিকার, নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতাহীনতা ইত্যাদি। * নারীরা সাধারণত সহজে চিহ্নিত করতে পারে না। * সমাজে নারীর অবস্থানের পরিবর্তনের চালিকা শক্তি হিসেবে দেখা হয়। * নারীর অবস্থানের উন্নয়ন ঘটায়। * সমাজে নারীর প্রচলিত জেভার ভূমিকা বা সমাজে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন করে তাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করে। * নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের (জেভার) উন্নয়ন ঘটায়। * শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সংগঠন, উদ্বুদ্ধকরণ, রাজনৈতিকভাবে অংশগ্রহণ, আত্ম-নির্ভরশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে লাগাতার প্রয়াসের মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। * একবার এ চাহিদা পরিপূরিত বা অর্জিত হলে তা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয় এবং এ চাহিদা পূরণের জন্য নতুনভাবে কোন প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না।

বাস্তবমুখী জেভার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে হয়তো নারীর বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব, কিন্তু এতে সমাজে তাদের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হবে না এবং উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ সব সময় প্রান্তিক পর্যায়েই থেকে যাবে। অন্যদিকে কৌশলগত জেভার চাহিদা পরিপূরিত হলে তা উন্নয়নে নারীর অধিকতর ও ব্যাপক অংশগ্রহণের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। উন্নয়নে নারীর ভূমিকার বাস্তব প্রয়োগ

নিশ্চিতকরণে জেভার সংবেদনশীলতা^{১০}, জেভার সচেতনতা^{১১} এবং যথার্থ জেভার পরিকল্পনা^{১২} নিশ্চিত করা দরকার। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর সমান অংশগ্রহণ ও সুফল অর্জন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জেভার পরিকল্পনা খুবই জরুরী। যথার্থ জেভার পরিকল্পনা নিশ্চিতকরণে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে :

- * আমরা যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকি তাতে উন্নয়নের প্রভাব নারী-পুরুষের ওপর সমভাবে ও নিরপেক্ষভাবে পড়ে না এবং উন্নয়নের সুফল, ব্যয়ভার ও দায়-দায়িত্ব সমভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে বন্টিত হয় না।
- * উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রমশক্তি নিয়োগ পরিকল্পনায় এবং সুবিধা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে জেভার অন্ধত্ব^{১৩} বিরাজ করে।
- * উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নারীর তিনটি ভূমিকা পালনের বিষয়টি প্রতিফলিত হয় না এবং নারীর কর্মভার বা বোঝা লাঘবে প্রয়োজনীয় কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয় না।
- * নারীর সুযোগ প্রদান বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমরা তাদের অতীত পশ্চাৎপদতার প্রভাবের কথা ভুলে যাই এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারীদের জড়িত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি না।
- * অনেক নীতি প্রণেতা ও উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ মনে করেন, জেভার ইস্যু আমাদের বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে এবং উন্নয়নের বিদ্যমান ধারা জেভার ইস্যুকে ধারণ করতে পারবে না।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, জেভার ইস্যু সম্পর্কে আমাদের অনেকের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেভার ইস্যুসমূহ কিভাবে সম্বোধিত হতে পারে তা স্পষ্টায়নের ক্ষেত্রে "জেভার সমতায়ন পরিকল্পনা কৌশলসমূহ^{১৪}" বর্ণিত ধারণা পরিবর্তনে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে "জেভার প্রভাব নিরূপণ" (Gender Impact Assessment বা GIA) পদ্ধতির ব্যবহার জেভার সমতায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। মূলত বিদ্যমান জেভার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জেভার উন্নয়নের অনন্য চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত।

১০ "জেভার সংবেদনশীলতা" হলো নারী উন্নয়নে প্রচলিত জেভার বিষয়সমূহ, পার্থক্য, ক্ষমতা, অসমতা, দক্ষতা এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলো উপলব্ধি এবং বিবেচনা করে এগুলো কর্মসূচি, কৌশল ও কার্যক্রমে সন্নিবেশিত করার অভিপ্রায়ে বৃদ্ধায়।

১১ "জেভার সচেতনতা" হলো জেভার সংবেদনশীলতা ও মনোভাব এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে নারীর চাহিদা ও অগ্রাধিকারকে স্থাপন করার অঙ্গীকার।

১২ "জেভার পরিকল্পনা"র লক্ষ্য হলো উন্নয়নের চালিকাশক্তি ও উপকারভোগী ও উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত জেভার শ্রমবিভাগের ধারণাকে অতিক্রম করে নারীকে সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব হিসেবে নারীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

১৩ "জেভার অন্ধত্ব" হলো এক ধরনের অহেতুক ধারণা, যেখানে উন্নয়নের সুফল আপনা-আপনি সমভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে বন্টিত হবে, উভয়েই সমভাবে লাভবান হবে এবং সমান দায়-দায়িত্ব বহন করবে বলে বিবেচনা করা হয়। এ ধারণা সমাজে জীবনের কাম্যতা বা পছন্দ-অপছন্দ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জেভার যে একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে তা উপলব্ধি করে না।

১৪ PLAGE (Policy Leadership and Advocacy for Gender Equality Planning) Project (2002): *Handbook on Gender Equality Planning Tools*. Ministry of Women and Children Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

৩.০ বাংলাদেশের জেভার চিত্র

ইতোপূর্বে জেভার ইস্যুসমূহ সম্পর্কে যে সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তার তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা বরং আরো খারাপ। বিগত তিন দশক ধরে সরকারের নানাবিধ ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও সমাজে নারীর অবস্থানের আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটেনি। উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। পুরুষের চাহিদাকে ঘিরে আবর্তিত প্রচলিত এ সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশ এক নতুন প্রেক্ষিত ও নতুন সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আত্মপোলক্লির প্রক্রিয়া খুবই ধীরগতি সম্পন্ন এবং তা কেবল সমাজের কিছু ক্ষুদ্রাংশে বা পকেটে সীমিত। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মহিলা এখনো গভীর বৈষম্যের শিকার। জন্ম থেকে শৈশব, এমন কি তার পরেও মহিলারা খুবই কম অধিকার এবং সুবিধা ভোগ করতে পারে। এর প্রমাণ অসংখ্য এবং সর্বদাই দৃশ্যমান। দেশে পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার হার কম। অতীতে তাদের অর্থনৈতিক অবদানকে পরিমাপ করা হয়নি এবং তার স্বীকৃতিও দেয়া হয়নি^{১৫}। সামাজিক বৈষম্যের কারণে মেয়েদের জন্মগত জৈবিক সুবিধাবলী (in-built biological advantage) খুব দ্রুতই নিঃশেষিত হয়ে পড়ে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে মেয়ের থেকে ছেলেদেরকে বেশি মূল্য দেয়া হয়, সেখানে নারীর তুলনামূলক নিম্ন-মর্যাদা সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত। মাতা-পিতার দৃষ্টিতে মেয়ে শিশু হচ্ছে পরিবারের সাময়িক অতিথি, যারা বিয়ের পরে অন্যের ঘরে চলে যায় এবং এজন্য মোটা অংকের যৌতুকের ব্যবস্থা করতে হয়। এমন কি বিয়ের পরে নতুন পরিবারেও নারীকে সেই চিরাচরিত নিম্ন-মর্যাদার গ্লানি বহন করে বেড়াতে হয়^{১৬}।

দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে অনেক পুরুষই মেয়েদের সন্তান ধারণ, তাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণকে কোন কাজ হিসেবে গণ্য করে না। বরং এগুলিকে মেয়েদের স্বভাবজাত হিসেবে মনে করা হয়। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর কাজের প্রকৃত মূল্যায়নের অভাব দেখা যায় নানাভাবে। “পুরুষেরা মেয়েদের কোন কাজ (?) করতে চায় না। তারা মনে করে এতে তাদের সম্মান হানি হবে।” —ঝগড়াপুরের এ চিত্রটি^{১৭} শুধু গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায়ই নয়, আমাদের সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার রঞ্জে রঞ্জে গভীরভাবে প্রোথিত। “..... তারা (পুরুষেরা) যেমন নিজেরা গৃহস্থালির কোন কাজ করে না তেমনি তাদের মেয়েদেরও গৃহস্থালির বাইরের কোন কাজ করতে দেয় না।” —এ চিত্রটিও আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অনেক পরিবারে এখনো দৃশ্যমান।

১৫ Mian, Md. Moazzem Hossain & Imam, Kazi Hasan (1994): Basic Services for Children and Women Development (CWD) in Urban Areas of Bangladesh. A research mimeo, Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka, p. 2.

১৬ Monsoor, Taslima (1999) : *From Patriarchy to Gender Equity : Family Law and its Impact on Women in Bangladesh*. The University Press Limited, Dhaka, p. 32.

১৭ মতিন, নিলুফার (১৯৯৮) : ঝগড়াপুর : গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী (বাংলা রূপান্তর), মূল : আরেল, ইয়েনেকা ও ব্যুরদেন, ইগোস ফান, গণপ্রকাশনী, গণমুদ্রণ লিমিটেড, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫০।

পুরুষ শাসিত এ সমাজের যে স্তরেই আমাদের অবস্থান হোক না কেন, বাস্তবত এটাই নির্মম সত্য যে, আমরা এখনো সম্পূর্ণভাবে এ দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে বেরিয়ে আসতে পারিনি। জন্মগতভাবে আমরা একজন নারী-কে "নারী" হিসেবে বা বড়জোর "মেয়ে-মানুষ" হিসেবে দেখতে শিখেছি, "সমাজের একজন মানুষ" হিসেবে দেখতে শিখিনি। নজরুলের সেই অমিয় বাণী—"এ পৃথিবীতে যা কিছু মহান যা কিছু কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"—শুধু সাহিত্যের বর্ণিল চতুরে দীপ্যমান হয়ে আছে, আমাদের বাস্তব আচরণে এখনো তার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটেনি।

নারীর প্রথাগত দাসত্বাবস্থা বাংলাদেশে আইনের মাধ্যমেও স্বীকৃত। সংবিধানে নারীর সম-অধিকারের কথা স্বীকৃত হয়েছে। তারপরেও সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইতিবাচক জেডার বৈষম্য [আর্টিকেল ৬৫(৩)]। আর্টিকেল-১০, যা রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের একটি, এখানে বলা হয়েছে—Steps shall be taken to ensure participation of women in all spheres of national life—এটার অর্থ হলো বিদ্যমান অবস্থায় নারীর অধিকার পুরুষের সমান নয় এবং এ বৈষম্য দূর করার জন্য সাংবিধানিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে^{১৮}। উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে ধর্মীয় অনুশাসন, বিদ্যমান ধর্মীয় আইনসমূহ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অনুশীলন, অশিক্ষা, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি থেকে। মূলত এগুলোই মানুষের সামাজিক জীবন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে।

ঐতিহাসিক কারণসমূহ এবং নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য সত্ত্বেও অবস্থার ক্রমাগত উন্নয়ন ঘটছে। অনেক শূন্যস্থানই ধীরে ধীরে পরিপূরিত হচ্ছে। কিছু কিছু পরিবর্তন সমাজে এ সম্পর্কিত ব্যাপক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটায়। উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এনজিও-গুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তাদের ব্যাপক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিভাত। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ, সুশীল সমাজের আন্দোলন, নারীর অধিকার সম্পর্কে নতুন নতুন প্রকাশনা, নতুন আঙ্গিকে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন, ফর্মাল সেক্টর প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদের চাকুরি, মহিলাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উন্নয়ন, ১৯৯৫ সালের বেইজিং ঘোষণা, ১৯৯৭ সালে ঘোষিত "নারীর অগ্রসরায়ণে জাতীয় নীতিমালা" (National Policy for the Women's Advancement), সাম্প্রতিককালে প্রণীত নারী অধিকার সংরক্ষণে বেশ ক'য়েকটি নতুন আইন, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়াদির ফলপ্রসূ মোকাবেলায় মহিলা ও শিশু নিপীড়ন আইন প্রণয়ন, মহিলাদের অধিকারের ক্ষেত্রে সিডো সনদের আর্টিকেল ১৩(১) ও ১৬(১)-এর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি প্রত্যাহার, রাজনীতি ও

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, জাতীয় সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাকানিজম শক্তিশালীকরণ ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যন্ত একটি সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রীভূতি প্রবর্তন, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল সুবিধা, ডে-কেয়ার সেন্টার, নিপীড়িত মহিলাদের জন্য নিরাপত্তা এবং আইনী সহায়তা কোষ ইত্যাদি সহায়ক-সেবার (Support Services) সংস্থান করা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত ৪৪টি ফোকাল-পয়েন্ট সিডো কমিটিতে উত্থাপিত এবং জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদে এগুলোর স্বীকৃতি লাভ, সরকারের নারী উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিওগুলোর অংশীদারিত্বমূলক অংশগ্রহণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক “Department of Women Studies” নামে বিএসএস (সম্মান) ও এমএসএস ডিগ্রীসহ একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর “Gender Dimensions in Development” শীর্ষক পৃথক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রকাশ, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জেভার সমতা পরিকল্পনা কৌশলসমূহ (Gender Equality Planning Tools) ব্যবহারে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি এক্ষেত্রে কতগুলো জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত।

আলোচ্য সকল অর্জন সত্ত্বেও মহিলাদের অনুন্নয়নের মূল কারণ হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জেভার ইস্যুসমূহের প্রতি বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা। প্রয়োজনীয় ক্যালোরী গ্রহণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদি, চাকুরি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা, বংশানুক্রমিক সম্পদাধিকার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে মহিলারা তুলনামূলক কম সুযোগ ভোগ করে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদেরকে সম-অবস্থানে দেখতে এখনো আমরা মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত নই। এ সকল বিষয়ের ফলশ্রুতিতেই মহিলারা আজো অনুন্নত এবং আমাদের দেশের মহিলাদের অনুন্নয়নের সমস্যাগুলো মূলত জেভার ইস্যুসমূহের প্রতি পুরুষদের বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যমগুলোর ব্যাপক সম্প্রচার, বর্ধিষ্ণু সামাজিক সচেতনতা, নতুন নতুন ও কঠোর আইনের প্রবর্তন, সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ, বর্ধিষ্ণু সুশীল সমাজ এবং এনজিও-আন্দোলন সত্ত্বেও সমাজে এখনো নারী নির্যাতনের ব্যাপকতা অনেক। বাংলাদেশের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা সাধারণত শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নিপীড়ন এবং যৌন-হয়রানি সহ্য করতে বাধ্য

হন, যার অনেকটাই আমাদের গোচরেও আসে না^{১৯}। সমাজে শুধু নারীরাই যে পুরুষের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তা নয়। এর উল্টোটি নিয়েও বিদগ্ধ মহলে আলোচনা আছে। উদাহরণত সেই চিরায়ত প্রবাদ—“রাজা শাসিছে রাজ্য, রাজারে শাসিছে রাণী”—যা এখনো আমাদের সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে বাস্তব সত্য হিসেবে বিরাজমান বলে বিদগ্ধজনেরা মনে করেন। কিন্তু এ বিষয়টি বহুল কথিত বা প্রচারিত (propagated) নয়। অন্যদিকে বেগম রোকেয়া তাঁর “নারীস্থান^{২০}”—এ-যে স্বপ্ন রচনা করেছিলেন, তা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতাপের প্রতি মহিলাদের অন্তর্নিহিত অনুভূতির গোপন চিত্র তুলে ধরে।

৪.০ বিশ্লেষণ

ইউএনডিপি’র দৃষ্টিকোণে জীবনের সর্ব-পরিসরে জেভার সমতা হচ্ছে টেকসই মানব উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ইউএনডিপি’র বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সকল কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের—উক্ত কর্মসূচি যাদের জীবনকে প্রভাবিত করে—তাদের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণই হচ্ছে টেকসই মানব উন্নয়নের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা^{২১}। আর এ সকল কর্মসূচি প্রাত্যহিক পারিবারিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে বৃহদাংশ বৈশ্বিক জনসংখ্যার সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনগত এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছে। সারা বিশ্বেই কিছু উপরি আচার-আচরণের পরিবর্তন ছাড়া নারী-পুরুষের শ্রম ও ক্ষমতা বিভাজনের মৌলিক ব্যবস্থাপনা একই রয়ে গেছে। বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিশ্বের বেশির ভাগ এলাকায় মানব ইতিহাসের প্রায় পুরোটা জুড়েই সন্তানের ভবিষ্যৎ, তার বসবাসের স্থান নির্বাচন, বিবাহ, বংশানুক্রমিক অধিকার, চাকুরি ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীর অধিকার খুবই নগণ্য^{২২}। যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিককালে পরিচালিত এক মিথস্ক্রিয় অ্যাকশন রিসার্চে দেখা গেছে, পারিবারিক সকল ঝুট-ঝামেলা পোহানোর দায়িত্ব শুধুই মহিলাদের—কর্মক্ষেত্রে ও পেশায় পুরুষের অধিকমাত্রায় উপস্থিতির কারণে সৃষ্ট এ ধরনের আত্ম-প্রসাদই জেভার বৈষম্যের জন্ম দেয়^{২৩}। সমাজ খুব ভালভাবে কাজ করে যখন মহিলারা ঘরে থাকে আর পুরুষেরা বাইরে কাজ করে—সমাজের গভীরে

১৯ Ibid, pp. 37-38.

২০ নারীস্থানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো পুরুষদেরকে বোঝানো যে, তাদের অনুভূতি কেমন হতো যদি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তারা যদি মহিলাদের অনুরূপ সম্মুখীন হতো এবং মহিলারা যদি তাদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করত, এখন যেমনটি তারা মহিলাদের প্রতি করে। আর এটার মূল উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে নারীর প্রতি পুরুষের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

২১ UNDP (1996): Overview : UNDP’s 1996 Report on Human Development in Bangladesh—A Pro-Poor Agenda, Orchid Printers, Dhaka, p. 27.

২২ Afkhami, Mahnaz (1999): A Vision of Gender in Culture. In : Serageldin, Ismail and Martin-Brown, John (ed.) : Culture in Sustainable Development : Investing in Culture and Natural Endowments, The World Bank, Washington D. C., pp. 47-48.

২৩ Bailyn, Lotte et. al. (2000) : Moving Corporations in the United States Towards Gender Equity—A Cautionary Tale. In : Haas, Linda L. et. al. ed. : Organizational Changes and Gender Equity : International Perspectives on Fathers and Mothers at the Workplace, Sage Publication, Inc., London, New Delhi, pp. 167-179.

গ্রোথিত কিন্তু প্রায়শ অকথিত এই বিশ্বাসই আরোপিত জেভার ভূমিকার মাধ্যমে সৃষ্ট জেভার বৈষম্যের জন্য দায়ী। এটা জেভার ইস্যুসমূহের প্রতি বিদ্যমান সুস্পষ্ট এবং গভীর দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার নির্দেশ করে।

জেভার ইস্যুসমূহের প্রতি ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে শিক্ষা কার্যত লিভারের মত ভূমিকা পালন করে^{২৪}। জীবন-যাপনে মহিলাদের প্রান্তিকতার জন্য মূলত তাদের শিক্ষাহীনতাই দায়ী। বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে শিক্ষার নিম্ন হার, বিশেষত নারী শিক্ষার নিম্ন হারের কারণেই জেভার-গ্যাপ খুবই সুস্পষ্ট^{২৫}। সামগ্রিকভাবে জেভার-দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বর্তমান সমীক্ষায় নিম্নের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বজনীন জেভার-ইস্যুসমূহকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

৪.১ জন্মাধিকারে বৈষম্য

বাংলাদেশে জেভার সমতা সম্পর্কিত প্রত্যাশা ও উদ্বেগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজে এ বিষয়ে সচেতনতাও দিন দিন বাড়ছে। মানুষ, বিশেষত সুশিক্ষিত জনেরা এটা অস্ত ত অনুধাবন করছেন যে, "আমি মেয়ে থেকে ছেলে সন্তান বেশি পছন্দ করি"—এ কথাটি এখন আর খোলামেলা বলাটা শোভনীয় নয়। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাত্র একটি সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ লোক ছেলে-সন্তান পছন্দ করেন। সরকারি কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের বয়স্ক লোকদের মধ্যে সুস্পষ্ট জেভার-পছন্দ (ছেলে-সন্তান পছন্দ) বিদ্যমান^{২৬}। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলে-সন্তান না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে একটার পর একটা সন্তান গ্রহণে বাধ্য করা হয়^{২৭}। মেয়ে-সন্তান অপেক্ষা ছেলে-সন্তান পছন্দ করার পেছনে যে কারণগুলো কাজ করছে, তা নিম্নরূপ :

- * ছেলেরা বংশগতির ধারা (Generation Flow) এবং পারিবারিক অবস্থান (Family Status) রক্ষা করে;
- * তারা বৃদ্ধ বয়সে মাতা-পিতার পরিচর্যা করে;
- * তারা সাধারণভাবে পারিবারিক দায়িত্ব কাঁধে নেয়;
- * তারা মাতা-পিতা ও পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা দেয়; এবং
- * তারা স্বাধীনভাবে ঘরের বাইরে চলাফেরায় সক্ষম।

অন্যদিকে যাদের এ ধরনের জেভার-পছন্দ নেই তাঁদের মতে :

- * যথার্থভাবে মানুষ করতে পারলে মেয়েরাও তাদের মাতা-পিতাকে সাহায্য করতে পারে;
- * বৃদ্ধ বয়সে ছেলেরা মাতা-পিতার পরিচর্যা করবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই;

২৪ Mongella, Gertrude (1995) : Women and Education : The Ultimate Lever. In : Haider, Raana. : A Perspective in Development : Gender Focus, The University Press Limited, Dhaka, p. 114.

২৫ ibid, pp. 114-115.

২৬ Fyzennessa, Noorunnahar (1994) : The Status of Reproductive Rights and Women's Health : Findings of a Survey. In : Jahan, Roushan et al. : Reproductive Rights and Women's Health, Women for Women, p. 67.

২৭ Ibid, p. 64.

- * ছেলে-মেয়ে উভয়েই জাতীয় জীবনে অবদান রাখতে সক্ষম;
- * মেয়েরা ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ও রান্নার কাজে মায়েদের সহায়তা করে; এবং
- * জীবনের সকল পরিসরে ছেলে-মেয়ে উভয়েই সমান।

উপর্যুক্ত মতামত বিশ্লেষণে এটা সহজেই অনুমেয় যে, বংশগতির ধারা রক্ষা করার বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে বিবেচিত হলেও জেভার-পছন্দের পেছনে মূল কারণগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক। যদি যথার্থরূপে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হ'ত অথবা তারা যদি তাদের মাতা-পিতা ও পরিবারকে অধিকতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম হ'ত, তাহলে বিদ্যমান জেভার-পছন্দের প্রকৃতি বা ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন হ'ত।

৪.২ খাদ্য ও পুষ্টি

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য খাদ্য একটি স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা। সাধারণত জৈবিক দৃষ্টিকোণে পুরুষের তুলনায় নারীর কিছুটা কম ক্যালোরির প্রয়োজন হলেও গর্ভাবস্থায় এবং মাতৃ-দুগ্ধদানকালে নারীর অধিক পরিচর্যা ও অধিক পরিমাণ ক্যালোরির আবশ্যকীয়তা দেখা দেয়—যে বিষয়টি আমাদের সমাজে প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের মেয়ে-শিশুরা সব সময়ই পুষ্টির অভাবে ভোগে। ৫ বছরের নীচে এবং ৫-১৪ বছর বয়সের মেয়েরা সাধারণত সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় যথাক্রমে ১৬% এবং ১১% কম ক্যালোরি গ্রহণ করে^{২৮}। এটা যে শুধুমাত্র অল্প বয়সী মেয়েদের মধ্যেই ঘটতে দেখা যায় তা নয়, প্রাপ্ত বয়স্ক নারীরাও নানা আর্থ-সামাজিক কারণে পুষ্টিহীনতার শিকার হয়। পারিবারিক খাদ্য তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও মেয়েরা সাধারণত সবার শেষে এবং পরিমাণে কম খায়^{২৯}। আর এ সকল কারণ তাদের জন্য এক "পুষ্টিহীনতার দুই চক্র" সৃষ্টি করে। অনেকে মনে করেন, কঠোর শ্রমের কারণে নারীর তুলনায় পুরুষের বেশি খাদ্যের প্রয়োজন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এটাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুশীলন হিসেবে বিবেচিত এবং সমাজের মেয়ে ও নারীদের মধ্যেও বিষয়টি গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে।

৪.৩ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে আরো নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, নারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা বাধার সৃষ্টি করবে না। সংবিধানের এই গ্যারান্টি-ক্লজ, সরকারের বহুবিধ ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং এনজিও-সমূহের অনেক আকর্ষণীয়

^{২৮} Rogers, Barbara (1995) : Women and Nutrition and Health. In : Haider, Raana. : A Perspective in Development : Gender Focus. University Press Limited, Dhaka, p. 97.

^{২৯} Muntemba, S & Dankelman, I (1995) : In : Haider, Raana. : A Perspective in Development : Gender Focus, University Press Limited, Dhaka, p. 135.

ইনস্টিটিউট প্যাকেজ-অফার সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সর্বস্তরে জেডার-বৈষম্য বিরাজ করে^{৩০}। নাইরোবি প্রতিবেদন অনুসারে- "Education is the basic tool for the full promotion and improvement of the status of women. It is the basic tool that should be given to women in order to fulfill their roles as full members of the society"^{৩১}—একটি সাক্ষাৎকারে মহিলারা একই ধরনের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে, শিক্ষা হচ্ছে নারীর হাতে একটি অস্ত্র, যা দিয়ে সে কাজ করতে, ইচ্ছা করলে তা দিয়ে সে অর্থ উপার্জন করতে পারে, তার স্বামীকে পারিবারিক জীবন যাপনে সহায়তা করতে পারে, সে তার ছেলে-মেয়েদের অপেক্ষিত ভালভাবে শিক্ষা দিতে পারে এবং পরিচর্যা করতে পারে। আবার এ শিক্ষার মাধ্যমে সে তার উপযোগী একজন জীবন-সঙ্গী বেছে নিতে সক্ষম হবে, যে তাকে যথার্থ মর্যাদায় উপযুক্ত আসনে আসীন করবে^{৩২}।

বিগত দু'দশকে আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের নিবন্ধন উৎসাহব্যঞ্জক হারে বৃদ্ধি পেলেও বারে পড়ার হারও (dropout rate) খুবই উদ্বেগজনক। গ্রামীণ এলাকার প্রায় সকল এবং শহর এলাকার দরিদ্র পরিবারের মাতা-পিতা মেয়ে-শিশু থেকে ছেলে-শিশুকেই শিক্ষাদানে প্রাধান্য দেয়^{৩৩}। ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুশীলনের কারণে তাদের বেশির ভাগই মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণকে পছন্দ করে না। তারা মনে করে, শিক্ষিত হলেই মেয়েরা স্বাধীনচেতা হয়ে পড়বে, যা তাদের নিজেদের, পরিবারের এবং সমাজের জন্য খুবই বিপজ্জনক^{৩৪}। মেয়েদের শিক্ষার ওপর সামাজিক শ্রেণী ও জেডারভিত্তিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের দ্বারাই বেশি অনুভূত হয় এবং সামাজিক শ্রেণীর অবস্থান যত উচ্চে, তাদের মধ্যে নারী-শিক্ষার ব্যাপারে এই আগ্রহ তত বেশি দেখা যায়^{৩৫}।

বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, শিক্ষিত পরিবারে মেয়ে-শিশুদেরকে গৃহশিক্ষকের সুবিধা সম্প্রসারণের আগ্রহ বেশি। অনেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অধিক গুরুত্ব দেয়। তাঁরা মনে করেন, মেয়ে-শিশুদের তুলনায় ছেলে-শিশুদেরকেই ভবিষ্যতে বাস্তব জীবনে বেশি চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু দেশের বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মেয়েদের জন্য পরিবহন, আবাসন এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন।

৩০ Husain, Syed Anwar (1995) : Women's Empowerment : Education and Culture. In : Jahan, Roushan. : Empowerment of Women: Nairobi to Beijing (1985-1995), Women for Women, Dhaka, p. 91.

৩১ The Nairobi Forward Looking Strategies for the Advancement of Women, 15-26 July, 1985, New York, United Nations, 1989, p. 41.

৩২ Mongella, Gertrude (1995) : Women and Education : The Ultimate Lever. In: Haider, Raana. : A Perspective in Development : Gender Focus, The University Press Limited, Dhaka, p. 117.

৩৩ ibid, p. 119.

৩৪ Op cit, p. 116.

৩৫ Duza, Asfia and Begum, Hanida A (1993) : Emerging New Accents : A Perspective of Gender and Development in Bangladesh. Women for Women, Dhaka, pp. 35-37.

বর্তমান সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে, সরকারি কর্মকর্তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, মেয়েরা শিক্ষার বিশেষ কিছু বিষয়ে ভাল করতে পারে। তাঁরা মনে করেন, শান্ত মেজাজ, মনোযোগিতা, আন্তরিকতা, ধৈর্য, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি গুণাবলীর কারণে শিক্ষা, চিকিৎসা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, নার্সিং, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, সমাজ কল্যাণ, চিত্রকলা, সংস্কৃতি, গান প্রভৃতি বিষয়ে ভাল করতে পারে। তবে ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় অধিকতর মেধাবী ও ধীশক্তি সম্পন্ন। অন্যদিকে মেয়েদের শেখার ক্ষমতা, ধৈর্য এবং শৃঙ্খলাবোধ বেশি। কিন্তু নারী-পুরুষের মধ্যে বোঝার ক্ষমতা, ফলাফল, সহনশীলতা ইত্যাদি কার বেশি এ ব্যাপারে জেভার-ভেদে মত-পার্থক্য দেখা যায়।

৪.৪ স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদিতে প্রবেশাধিকার

অগণিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নব্বুইয়ের দশকে স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের শিশু ও মহিলা স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদি এমন কি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদি বিশেষত বড় বড় শহর ও নগরে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এ সকল সুবিধাদির কতটুকু মহিলাদের দ্বারা পৌঁছেছে তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। মহিলাদের স্বাস্থ্য সুবিধা সম্প্রসারণ শুধু কারো আর্থিক ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল নয়। দৃষ্টিভঙ্গিগত বিষয়াবলী এখানে বিরাট ভূমিকা পালন করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মহিলারা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা ভোগ করে। এছাড়াও বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কারণে ব্যয়বহুল চিকিৎসা সুবিধাদি পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই ভোগ করে থাকে। আর মহিলাদেরকে সাধারণত কম ফলপ্রসূ চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদান করা হয়^{৩৬}।

অন্যদিকে বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে এক বিচিত্র মাইন্ড-সেট বিদ্যমান। তারা প্রায়শই তাদের নিজের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে তাদের শিশু ও পরিবারের প্রয়োজনকে বড় করে দেখে^{৩৭}। প্রকৃতিগত দিক থেকে বাংলাদেশের মেয়েরা মানিয়ে চলায় অভ্যস্ত। তারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে তাদের খাবারের অনেকাংশ অবলীলায় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের পাতে তুলে দেয়। আর এ সকল কারণে ধীরে ধীরে তারা নীরবে পুষ্টিহীনতার চক্রে নিপতিত হয়। "Since suffering in silence is culturally ascribed feminine attribute—so too is its spin-off effect on health. The 'culture of silence and endurance' encourages women to give lower priority to their health needs compared to the demands of other family

৩৬ Khutun, Khadija & Others ed. (1995) : Women and Development : Relevant Statistics, March, 1995, Women for Women, Dhaka, pp. 104-109.

৩৭ Younis, Nabil et al. (1994) : Learning about the Gynecological Health of Women. The Policy Series in Reproductive Health, No. 2, The Population Council, Cairo.

members and reinforces their lower status^{৩৮}। এ কারণে ভগ্ন-স্বাস্থ্য মহিলাদের মধ্যে জাতিগত সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা মেয়ে-শিশু অপেক্ষা ছেলে-শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে^{৩৯}। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণে মেয়েদেরকে জন্মলগ্ন থেকেই দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ছেলেদের তুলনায় তাদেরকে হেলাফেলাভাবে লালন-পালন করা হয়। এ কারণে তারা বেশি অসুস্থ-প্রবণ আর চিকিৎসা সুবিধাও পায় কম^{৪০}। গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিকভাবে সংজ্ঞায়িত নারীর ভূমিকা—স্ত্রী ও মা—এ সম্পর্কিত না হলে অসুস্থতার ক্ষেত্রে মহিলারা প্রায়শই স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়^{৪১}। তাদের অসুস্থতার বিষয়টি তখনই গোচরীভূত হয়, যখন তার প্রভাব পরিবার প্রধানের ওপর পড়ে। যৌথ পরিবারে সাধারণত স্বামী কর্তৃক তাদের অসুস্থতার বিষয়টি গোচরীভূত হয়, যখন তার অসুস্থতার কারণে পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা পরিবারের কাজ-কর্ম অচল হয়ে পড়ে^{৪২}।

৪.৫ চাকুরির সুযোগের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার

প্রজাতন্ত্রের চাকুরির ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান প্রবেশাধিকার সাংবিধানিক আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে^{৪৩}। এছাড়া উন্নয়নে মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কোটা-পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। এনজিও এবং সরকারি এজেন্সীসমূহ প্রায়শই বিভিন্ন চাকুরির ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্য দেয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মহিলাদের বাড়ির বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ইতিবাচক—যতক্ষণ এ কারণে পরিবারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়^{৪৪}। অপর এক সমীক্ষায় ফলাফলে দেখা গেছে, কর্ম-পরিবেশে মহিলা শিল্প-শ্রমিকেরা পুরুষের তুলনায় বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। তাদেরকে সাধারণত কঠিন কোন দায়িত্ব দেয়া হয় না, এমন কি যখন মহিলা ও পুরুষ একই ধরনের কাজ করে। কেউ কেউ এটাকে মহিলাদের কর্ম-নিপুণতার বদলে পুরুষের শক্তিকে পুরস্কৃত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক^{৪৫} মর্মে আখ্যায়িত করেন। অন্যেরা এটাকে মহিলা সহকর্মীদের প্রতি পুরুষদের সহমর্মিতা বলে আখ্যায়িত করতে পারে।

৩৮ Rogers, Barbara (1995) : Women and Nutrition and Health. In : Haider, Raana. : A Perspective in Development : Gender Focus. University Press Limited, Dhaka, p. 105.

৩৯ Gribble, James N. and Preston, H. Samuel (1993) : The Epidemiological Transition : Policy and Planning Implications for Developing Countries, National Academy Press, Washington D. C.

৪০ op cit, p. 96.

৪১ Khattab, Hind et. al. (1994) : Methodology for Entry in the Community. The Policy Series in Reproductive Health. No. 3, The Population Council, Cairo.

৪২ Government of the People's Republic of Bangladesh (1988) : Bangladesh Health Services Report, Dhaka.

৪৩ Government of the People's Republic of Bangladesh. : Bangladesh Constitution. Dhaka, p. 8. Part-III.

৪৪ Charles, Nickie (1993) : Gender Division and Capitalism. In : Gender Division and Social Change, Harvester, Wheatsheaf, Hertfordshire, UK.

৪৫ Hossain, Hameeda et al. (1990) : No Better Option? Industrial Women Workers in Bangladesh. University Press Limited, Dhaka.

অনেকে মনে করেন, মহিলাদের জন্য কিছু বিশেষ ধরনের চাকুরি, বিশেষত চিকিৎসা, শিক্ষা, নার্সিং, ডে-কেয়ার-সার্ভিস, সাচিবিক কার্যক্রম, কম্পিউটার, টেলিফোন অপারেটিং, ব্যাংকিং, গবেষণা কার্যক্রম এবং প্রশাসন ইত্যাদি পেশাকে উপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন।

অনেকে চাকুরির সুযোগ প্রাপ্তিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্যে দেন এজন্য যে, পুরুষদেরকেই একদিন পারিবারিক দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। অন্যদিকে অনেকে সমাজে মেয়েদের অবহেলিত অবস্থান ও বিদ্যমান জেডার-বৈষম্যের কারণে চাকুরিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

৪.৬ কর্ম-পরিবেশে জেডার ইস্যুসমূহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে অথবা জীবনের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে পেশাজীবী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মহিলারা তাদের দীর্ঘ-শতকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথার বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। আর এগুলো করতে গিয়ে কর্ম-পরিবেশে তারা কখনো অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে, আবার কখনো তাদেরকে নানামুখী সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, অধস্তনদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মহিলা সহকর্মীরা খুবই আত্মপ্রত্যয়ী। পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে তাদের কাজের মান খুবই সন্তোষজনক^{৪৬}। একই সাথে এমনও উদাহরণ আছে যে, পুরুষ বসেরা তাদেরকে প্রথমে মহিলা এবং পরে কর্মী হিসেবে বিবেচনা করে। তাদের স্থৈতিকতা (Potentiality)/সৌজন্যবোধকে প্রায়শই ভুল বোঝা হয়। কর্মজীবী মহিলাদের কর্ম-দক্ষতাকে সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখা হয়; অফিসের সহকর্মীরা একজন মহিলার শ্রেষ্ঠত্বকে মানসিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না; অধস্তন পুরুষ সহকর্মীরা তাদের ওপর একজন মহিলার কর্তৃত্ব পছন্দ করে না^{৪৭}। আমাদের সমাজে লিঙ্গ-বিভাজিত কর্ম-বৈষম্য মূল্যবোধের অংশ হিসেবে বিবেচিত। যার ফলে বিভিন্ন পেশায় মহিলাদের প্রবেশাধিকারকে অস্বীকার করা হয়^{৪৮}। ফলে পেশাজীবী ও কারিগরী চাকুরিতে মহিলাদের উপস্থিতি খুবই কম। কর্মজীবী মহিলারা প্রায়শই তাদের বস কর্তৃক যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়^{৪৯}। অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে, একই পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কর্ম-বন্টনের ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষ বসের আনুকূল্য পেয়ে থাকে এবং তুলনামূলক সহজ ও হালকা কাজগুলো (যেমন যে কাজে

৪৬ Haque, A. K. M. Hedayatul and Bala, Hiralal (1988) : Women in the Bangladesh Civil Services, Bangladesh Public Administration Training Centre, Saver, Dhaka, pp. 70 and 110.

৪৭ Maitra-Sinha, Anjana (1993) : Women in Changing Society. Ashish Publishing House, New Delhi, p. 42.

৪৮ Jahan, Selina Akhter (1991) : Recent Bangladesh : Women and Children. Vasa Prokash, Dhaka, p. 10.

৪৯ ibid.

শারীরিক পরিশ্রম কম লাগে, ভ্রমণ কম করতে হয় অথবা কম ঝুঁকিপূর্ণ) সাধারণত তাদেরকে দেয়া হয়^{৫০}।

বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, কর্মক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালনে নারী-পুরুষ উভয়েরই একটি নির্দিষ্ট মানের কর্মদক্ষতা রয়েছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সংগঠন, নেতৃত্ব প্রদান, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিচালনা, উদ্বুদ্ধকরণ, তত্ত্বাবধায়ন, যোগাযোগ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রফেশনাল দক্ষতা, কাজের গুণগত মান ও গতি, প্রকাশ ক্ষমতা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ, জবাবদিহিতা, বিচার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, সহযোগিতা, সচেতনতা এবং দলগত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পুরুষের সামর্থ্য নারীর তুলনায় বেশি। অন্যদিকে মহিলারা অধিকতর সং, শৃঙ্খলাবোধ-সম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য।

৪.৭ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা

সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর সাম্প্রতিককালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৬০%-এর বেশি মহিলা কর্মকর্তা যে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের পুরুষ তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তার ওপর নির্ভরশীল^{৫১}। অপরদিকে কর্মক্ষেত্রে পুরুষ তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ মনে করেন যে, মহিলা কর্মকর্তাদের ৬৬% দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুবই পারদর্শী^{৫২}। কিন্তু বেশ কিছু সমীক্ষার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রত্যাশা প্রায়শই পুরুষের আধিপত্যে পদদলিত হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর তুলনায় পুরুষেরা অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করে। জীবনসঙ্গী নির্ধারণে মহিলাদের স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষেরা খুবই রক্ষণশীল। পরিবারের কনিষ্ঠ মহিলা-সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর তাদের আস্থা খুবই কম। অন্যদিকে মহিলা-সদস্যবৃন্দ পুরুষদের সিদ্ধান্তের ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল এবং পারিবারিক পর্যায়ে নারীর তুলনায় পুরুষেরা অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। কর্মক্ষেত্রেও নারীর তুলনায় পুরুষেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, মহিলারা মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের সিদ্ধান্তের প্রতি অধিকতর আস্থাশীল।

৪.৮ উন্নয়ন ও জাতি গঠন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের চেতনা-লালিত বিশ্ব থেকে মূলত নারীর পরিদ্রাণের কোন উপায় ছিল না। সেকালে নারী বড়জোর গৃহবধূ হিসেবে বিবেচিত হ'ত। তাদের সামর্থ্যের কোন স্বীকৃতি ছিল না, তাদের স্বেতিকতা

৫০ Haque, A. K. M. Hedayatul and Bala, Hiralal (1988) : Women in the Bangladesh Civil Services, Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka, p. 54.

৫১ ibid, p. 56.

৫২ op cit, p. 67.

হ'ত চরমভাবে অবহেলিত। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সমাজের মানুষের মধ্যে অবিচার ও জেভার-বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া, বিশেষত নারীর ভোগান্তি সম্পর্কে বর্ধিষ্ণু সচেতনতার জন্ম নিচ্ছে। এ সকল দীর্ঘ ভোগান্তি অতিক্রম করে নারীরা ক্রমশই তাদের পূর্ণ স্বৈতিকতা নিয়ে জেগে উঠছে। জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে তারা তাদের দক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে প্রমাণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু মৌলবাদী ও নব্য-মৌলবাদীদের পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ-পদ্ধতি তাদের এই প্রতিশ্রুতিশীল নব-জাগরণের পথে প্রায়শই বিরাট অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে^{৫৩}। এমন অসংখ্য রাধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মহিলারা ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে নিয়োজিত করছে। উন্নয়নমুখী এনজিও-সমূহ, নারীবাদী সংস্থাসমূহ, সামাজিক সংগঠনসমূহ প্রভৃতি এক্ষেত্রে নারীদের উদ্বুদ্ধকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। সরকারও উন্নয়ন এবং জাতি গঠন কার্যক্রমে নারীর বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তা সত্ত্বেও দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে সমাজের বেশিরভাগ লোকের মধ্যে এখনো জাতীয় উন্নয়নে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণকে মেনে নেয়ার মত মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক (formal and informal) সেষ্টরে নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকার স্বীকৃতিও জেভার-বৈষম্যকে ব্যাপকভাবে (drastically) কমিয়ে আনতে পারেনি^{৫৪}।

কিছু নির্বাচিত জাতি গঠন কার্যক্রমে—যেমন, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, ব্যবসা ও বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহিলারাও এ ধরনের অবস্থা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আত্ম-প্রত্যয়ী নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নে এবং মহিলাদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে দেশে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪.৯ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

কোন সমাজে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিশ্লেষণে UNDP কর্তৃক উদ্ভাবিত GEM সূচক নির্দেশ করে যে, একই ধরনের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পন্ন অন্যান্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের হার অনেক বেশি^{৫৫}। বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বর্তমান অবস্থানের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিংশ শতাব্দির শুরুতে বঙ্গীয় নারী

৫৩ Guhathakurda, Meghna and Begum, Suraiya (1995) : Political Empowerment of Women's Movement. In : Empowerment of Women : Nairobi of Beijing (1985-1995) : Women for Women, Dhaka, p. 41.

৫৪ Hossain, Hameeda (1999) : Women in Politics. In : Ahmad, Mohiuddin (ed.) : Bangladesh Towards 21st Century, Community Development Library, Dhaka, p. 177.

৫৫ UNDP : Human Development Report 2000. Oxford University Press, New York, 2000, pp. 172-173.

সমাজ ভোটাধিকার প্রয়োগে নারীর লিঙ্গীয় বৈষম্য দূরীকরণের সমর্থনে এবং নারীর প্রাধিকার (entitlement) নিশ্চিতকরণে এগিয়ে আসে^{৫৬}। বাংলার নারী আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারীরা ছিল মূলত সমাজের উচ্চ-স্তরের সুশিক্ষিত মহিলা, যারা ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যাপক আধিপত্য সম্পন্ন অবস্থান ভোগ করছিল এবং সমাজে যাদের উচ্চ ধর্মীয় অবস্থান ছিল^{৫৭}। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে এদেশের নারী সমাজ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর ভোটাধিকার ও রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের অধিকারসহ সমাজে তাদের সম-অবস্থান এবং সম-অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। কিন্তু নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাস্তবত নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্যেই মূলত সীমিত রয়েছে। রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ শুধুমাত্র শক্তিশালী রাজনৈতিক পরিবারগুলোর মধ্যেই সীমিত রয়েছে^{৫৮}। মহিলা ভোটাররা মনে করেন এবং প্রায়শই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পুরুষের তুলনায় নারীরা "বেশি আন্তরিক, পরিশ্রমী, সৎ ও অকপট এবং নীতিবোধসম্পন্ন" এ কারণে আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় তাঁরা একটি সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবেন। তাঁরা সমাজে নারীর অবস্থানের উন্নয়নে জেডার ইস্যুসমূহের ব্যাপারে অধিকতর কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজে নারীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে এমন কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসছে না।

নব্বুইয়ের দশক থেকে উন্নয়ন চিন্তা-চেতনায় নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। রাজনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক নীতির বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের বিবেচনাটি বর্ধিষ্ণু চাহিদা আকারে উপস্থাপিত হতে থাকে। বাংলাদেশ (ক) The Plan of Action (Mexico 1975), (খ) The Forward Looking Strategies (Nairobi 1985) ও (গ) The Beijing Plan of Action (1995) সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কৌশলপত্রে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের UNCEDAW অনুমোদন করার কারণে জন-সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। দেশের সংবিধানও এ প্রতিশ্রুতিকে পুনর্নিশ্চিত করে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণ তৃণমূল পর্যায়ের জন-জীবনে নারীর দৃশ্যমানতাকে প্রশস্ত করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের নারীর অবস্থান “.... have remained outside the play of power politics. Their visibility in popular struggles for democracy, in election campaigns and in community work has not been translated into greater

৫৬ Southard, Barbara (1996) : The Women's Movement and Colonial Politics in Bengal 1921-1936. University Press Limited, Dhaka, pp. 72-74.

৫৭ Ibid, pp. 43-47.

৫৮ Maitra-Sinha, Anjana (1993) : Women in Changing Society. Ashish Publishing House, New Delhi, pp. 58-59.

influence in the public domain. Only a small number have been able to enter positions of public decision-making. Their dependence upon traditionally powerful structures within the national political structures has limited their role as cheerleaders.৫৯”।

তুলনামূলকভাবে ছাত্র-রাজনীতিতে নারী অধিকতর দৃশ্যমান^{৬০} হলেও পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, জাতীয় রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব খুবই কম। স্বাধীনতাত্ত্বের কাল থেকে সংসদে নারীর অংশগ্রহণ কখনোই ৩.০%-এর বেশি হয়নি। এক সময় সংসদের জন্য সংবিধানে ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংস্থান থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া এবং নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তাদেরকে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে বিরত রেখেছে^{৬১}। বর্তমান সংস্থানের আলোকে সংরক্ষিত মহিলা আসনের বাস্তব কার্যকারিতা কি হবে ভবিষ্যতই এর প্রমাণ দেবে।

বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, পুরুষেরা সাধারণত তাদের প্রতিপক্ষ মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে খুবই উদার। কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব পরিবারের নারী সদস্যের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। নিজস্ব পরিবারের নারী সদস্যের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে নানাবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপারে পরিবারের নারী সদস্যদের মধ্যেও একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন, পুরুষেরা রাজনৈতিক কার্যক্রমে অধিকতর দক্ষ। তাঁরা ঝুঁকি গ্রহণে, চাপ (stress) ব্যবস্থাপনায়, রাজনৈতিক শক্তি পরিচালনায়, রাজনৈতিক দুরবস্থা (hazards) মোকাবেলায়, রাজনীতিতে শক্তি সংগঠনে ও সঞ্চয়নে নারীর তুলনায় অধিকতর সমর্থ এবং তারা খুবই দক্ষতার সাথে রাজনৈতিক লড়াই পরিচালনা করতে সক্ষম।

শক্তির রাজনীতি (power politics) এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও কার্যক্রমের প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের নীরব ও বর্ধিষ্ণু ভীতির সঞ্চার ঘটছে, সেখানে নারী নিজেকে উপযুক্ত অথবা স্বস্তিকর নাও মনে করতে পারে। সন্ত্রাস ও রাজনীতির নোংরা খেলা সাধারণ্যে এ ধরনের অনুভব ও ভীতি সঞ্চারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে। বিদ্যমান অবস্থায় নারীকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পদ্ধতির মত—যেখানে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে—

৫৯ Hossain, Hameeda (1999) : Women in Politics. In : Ahmad, Mohiuddin (ed.). : Bangladesh Towards 21st Century, Community Development Library, Dhaka, p. 178.

৬০ Guhathakurda, Meghna and Begum, Suraiya (1995) : Political Empowerment of Women's Movement. In : Empowerment of Women : Nairobi to Beijing (1985-1995), Women for Women, Dhaka, p. 37.

৬১ op cit, p. 181.

তদ্রূপ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীকে রাজনীতিতে নিয়ে আসার জন্য একটি জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৪.১০ বংশানুক্রমিক সম্পদাধিকার

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে নারীর বংশানুক্রমিক সম্পদাধিকার যৌতুকের (স্ত্রী-ধন) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সন্তানহীন বিধবা নারীর জীবদ্দশায় তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির মাধ্যমে অর্জিত উপার্জনের ওপর একটি ভোগাধিকার ছিল। তরুণী বিধবা, বিশেষত যারা পুরুষ সন্তানহীন, তারা পরিবারের অপ্রত্যাশিত বোঝা হিসেবে বিবেচিত হ'ত। যদিও যৌতুক প্রথাকে একটি অশুভ অনুশীলন (সামাজিক ব্যাধি) হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এ সমস্যার উত্তরণে যৌতুক বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে, তথাপি যৌতুকের অমানবিক অনুশীলন হ্রদম চলছে^{৬২}। অন্যদিকে মুসলিম আইনে কন্যা-সন্তান পুত্র-সন্তানের অর্ধাংশ বংশানুক্রমিক সম্পদাধিকার ভোগ করার বিধান থাকার কারণে তাত্ত্বিকভাবে মুসলিম নারীদের বৃহত্তর সম্পদাধিকার রয়েছে^{৬৩}।

বিদ্যমান বংশানুক্রমিক সম্পদাধিকার ব্যবস্থার প্রশ্নে সমাজে মত-পার্থক্য রয়েছে। বিদ্যমান সম্পদাধিকার আইন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই যথার্থ বিধায় অনেকে প্রচলিত পদ্ধতিকে সমর্থন করেন। বর্তমান সমীক্ষাধীন উত্তরদাতাদের অভিমত হলো, মহিলারা তাদের মাতা-পিতা ও স্বামী উভয় পক্ষ থেকেই সম্পদের অংশীদারিত্ব পায়, সুতরাং সম্পদাধিকারের বিদ্যমান পদ্ধতি যথার্থভাবে সঠিক আছে। কিন্তু যারা বিদ্যমান পদ্ধতি সঠিক নয় বলে মনে করেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে :

- * যেহেতু মাতা-পিতার দৃষ্টিতে জেভার-নির্বিশেষে সকল সন্তানই সমান, সেহেতু সম্পদ বিতরণ সমভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- * যেহেতু মেয়েরা তাদের মাতা-পিতার অধিক যত্ন নেয় এবং যেহেতু তারা জীবনের প্রতিটি স্তরে দুর্বল, সেহেতু তাদের অধিক সম্পদের প্রয়োজন।

উপর্যুক্ত মতাদর্শের আলোকে তাঁরা সম্পদ বণ্টনে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান সম্পদাধিকার পদ্ধতির যথোপযুক্ত আঙ্গিকে সংশোধনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.১০ প্রাধিকার ও ক্ষমতায়ন

UNDP কর্তৃক নিরূপিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, যেকোন সমাজ ব্যবস্থায় আয়-স্তর ও জেভার-বৈষম্যের মধ্যে কোন গাণিতিক সম্পর্ক নেই। তার অর্থ হচ্ছে, জেভার-বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার বিষয়টি উচ্চ আয়ের সাথে

৬২ Maitra-Sinha, Anjana (1993) : Women in Changing Society. Ashish Publishing House, New Delhi, pp. 11-16.

৬৩ Southard, Barbara (1996) : The Women's Movement and Colonial Politics in Bengal 1921-1936. University Press Limited, Dhaka, p. 45.

সম্পর্কিত নয়। UNDP-’র মানব উন্নয়ন রিপোর্ট-২০০০ অনুসারে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নরওয়ের অবস্থান প্রথম, যেখানে বিশ্বের অনেক দেশের আয়-স্তর নরওয়ের থেকে অনেক বেশি। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অনেক উন্নয়নশীল দেশের জেভার-ক্ষমতায়ন অবস্থা অনেক ধনী ও উন্নত দেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল৬৪। উদাহরণত জেভার মতায়নের ক্ষেত্রে বারব্যাডোসের অবস্থান সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং বেলজিয়ামের তুলনায় ভাল; আবার ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং ইরিল্যান্ডের অবস্থান যুক্তরাজ্যের তুলনায় ভাল; বাহামাসের অবস্থান পর্তুগাল ও স্পেনের তুলনায় ভাল। এ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বল্প-আয়ের দেশগুলোতেও জেভার-ক্ষমতায়ন সম্ভব। বাংলাদেশের GEM-অবস্থা একই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশ ভাল।

প্রকৃত পক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন একটি ধারণা, যা বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইনগত ইস্যুর সমন্বিত কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করে। NFS (Nairobi Forward Looking Strategies) ও CEDAW’র উদ্যোগী স্বাক্ষরদাতা হিসেবে এবং দ্বন্দ্বিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে (having conflicting socio-cultural matrix) বাংলাদেশ কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপকভিত্তিক মূলনীতিমালার পরিকল্পনা করছে, যেখানে নারী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নের পরোক্ষ উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হবে না, বরং তাদের নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। বর্তমানে মহিলাদেরকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং সমাজের সকল পর্যায়ের—পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ের—সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হচ্ছে৬৫। নির্বাচনী ও প্রতিনিধিত্বকারী রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই মহিলাদের অংশগ্রহণ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে৬৬। এটি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের পরিচায়ক। এছাড়া ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে, বিশেষত নির্বাচনী রাজনীতিতে মহিলাদের প্রান্তিক অবস্থার অনেক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। গৃহবধূ থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরের মহিলারা তখনকার বিক্ষুব্ধ রাজনীতিতে অংশ নিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ আন্দোলনটির পুরোভাগে ছিল তিনটি জোট-শক্তি, যার দু’টির নেতৃত্বে ছিলেন দুই নেত্রী। যদিও উভয় নারীই রাজকীয় সম্পর্কের কারণে স্ব-স্ব দলের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, দলীয় নেতৃত্বে শক্তহাতে হাল ধরা এবং দলকে ভাঙ্গনের মুখ থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাঁরা উল্লেখযোগ্য দক্ষতা/সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

৬৪ Rahman, Shaheen (1998) : About Gender and Development. Steps Towards Development, Dhaka, p.11.

৬৫ Choudhury, Dilara (1998) : Women’s Participation in the Formal Structure and Decision-Making Bodies in Bangladesh. In : Empowerment of Women: Nairobi to Beijing (1985-1995), Women for Women, Dhaka, pp. 2-4.

৬৬ op cit, p. 7.

এছাড়া বিএনপি ও আওয়ামী লীগে বেশ ক'জন নারী রাজনীতিবিদের সমাবেশ ঘটেছে, যাঁরা তাঁদের যোগ্যতা, সফলতা ও দক্ষতার মাধ্যমে রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান সংহত করতে সমর্থ হয়েছেন। ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে ৩৬-৪০ জন মহিলা প্রার্থী—১৯৮৬ সালের দ্বিগুণ—বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক প্রবণতার স্বাক্ষর বহন করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের DWAN (Development Alternatives with Women for a New Era) দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় এনে বর্তমান সমীক্ষায় শুধুমাত্র সংকীর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে নয়, বরং (ক) সমাজের বিভিন্ন শক্তি-ভিত্তিতে (power-bases) ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এবং (খ) তৃণমূল পর্যায়ে আন্দোলন ও আত্মপোলক্লির জাগরণের (conscientization) ক্ষেত্রেও মনোনিবেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ধারণাটি অত্যন্ত নতুন। WID (Women in Development) ধারণাটি বাংলাদেশে UN Women's Decade from ১৯৮৫-১৯৯৫ 'র প্রাক্কালে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এনজিও-দের তৃণমূল আন্দোলন ও আত্মপোলক্লির জাগরণ কর্মসূচি একটি সামাজিক সেবা-কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এটি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি সক্ষম ও শক্তিশালী কৌশল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেখানে নারীর ক্ষমতায়নের অন্যান্য ইস্যুসমূহ যেমন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, গ্রামীণ ঋণ ও আয়-উপার্জন, শিক্ষা, ওকালতি (advocacy), দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং আত্মপোলক্লির জাগরণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারও VGFP (Vulnerable Group Feeding Programme), Rural Credit Programme, PLAGE ইত্যাদির মত অনেক নারী-কেন্দ্রিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শহর ও গ্রামীণ উভয় পরিবেশেই মহিলারা প্রায়শই বর্ধিষ্ণু হারে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে এবং অপ্রচলিত কার্যক্রমকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে^{৬৭}। এগুলো সবই নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশক।

সমাজে নারীর আইনগত অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা সাধারণত পুরুষের অধীনস্ত বা পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিবারে এবং সমাজে নারীর বাঁধা-ধরা ভূমিকা সম্পর্কে বিদ্যমান প্রচলিত ধারণাই তাদের এই অধস্তন-ভাবমূর্তিকে আরো অধিকমাত্রায় সজ্জিন করে তোলে। সমাজে নারীর এই অধস্তন অবস্থানের জন্য আর্থ-সামাজিক ও আইনগত পরিসরে নারীর প্রতি সমাজের নেতিবাচক মনোভাব, ধর্মীয় কুসংস্কার, পুরুষবাদী, স্বাতন্ত্রিক এবং

৬৭ Huq, Jahanara (1995) : Empowerment of Women in Bangladesh : The Rural Scenario. In : Empowerment of Women : Nairobi to Beijing (19985-1990), Women, Dhaka, pp. 62-65

পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত দায়ী। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের মহিলারা পশ্চিমা সভ্যতায় বিদ্যমান নারী-অধিকারে বিশ্বাসী নয়। নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার সম্পর্কে তাদের নিজস্ব এবং স্বাভাবিক ধারণাগত বিশ্বাস রয়েছে, সেটা সমাজে তাদের শান্তিপূর্ণ, নির্ভরশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য জীবন-যাপনে নিশ্চিতকরণ অপরিহার্য।

সমাজে এ ধরনের বিশ্বাস অত্যন্ত প্রকট। প্রকৃতপক্ষে প্রাধিকার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বৈষম্যই তাদের মধ্যে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে। মূলত অশিক্ষা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, দারিদ্র, ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপলব্ধিই সমাজে নারীর পশ্চাৎপদতার মূল কারণ। নারীর পশ্চাৎপদতার কারণে শিক্ষিত সমাজের অনেকে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন। তাঁরা নারী শিক্ষার জন্য বর্ধিত সুবিধাদি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র বিমোচন, যথার্থ ধর্মীয় জ্ঞানের আলোয় মানুষকে উদ্ভাসিত করা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু তাঁরা নারীর রাজনৈতিক সম্পৃক্তি এবং আইনগত প্রথার আধুনিকায়নের প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি।

৪.১১ প্রজননাধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্য

বাংলাদেশে "প্রজনন অধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্য" বহুল আলোচিত বিষয় নয়। এ বিষয়ে মহিলাদের নিজেদের আগ্রহও কম। আমাদের প্রচলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা এ বিষয়বলী উন্মুক্ত আলোচনা ও শিক্ষাদানে সমর্থন দেয় না। সাম্প্রতিক সময়ে শহর এলাকার, বিশেষত রাজধানী শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত নারী সমাজের মধ্যে "প্রজনন অধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্য" সম্পর্কিত ধারণাটির পক্ষে জোরালো বক্তব্য উচ্চারিত হচ্ছে^{৬৮}।

কোন সমাজের প্রজনন স্বাস্থ্যাবস্থা সমাজটির আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়। জেভার-নির্দিষ্ট কাম্য পুষ্টির অভাব, নিরাপদ পানি ও পয়ঃ সুবিধাদিতে নিম্ন প্রবেশাধিকার, নারীর অধস্তন অবস্থান এবং পরিবেশগত বিপন্নাবস্থা কোন সমাজের সামগ্রিক প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন ব্যক্তির জীবন-যাপন প্রণালী বা জীবনাচরণ, বিশেষত তার যৌন-জীবনাচরণ পদ্ধতি প্রজনন স্বাস্থ্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাবলীর প্রাপ্যতা, ব্যবহার এবং ফলপ্রসূতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান সমীক্ষায় প্রজননাধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্যের কারিগরী বিষয়াদির পরিবর্তে সমাজে বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গিগত বিষয়াদির ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

৬৮ Akhter, Farida (1994) : Reproductive Ringhts : A Critique from the Realities of Bangladesh Women. In : Jahan, Roushan et al ed. : Reproductive Rights and Women Health, Women for Women, Dhaka, p. 46.

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিগত ২-৩ দশক ধরে বাংলাদেশে প্রজনন হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পূর্বের তুলনায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অধিক ব্যবহার এ অর্জনের মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে। আমাদের দেশে প্রজনন অক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্যের ঘাটতি প্রকট। এগুলো নিরূপণ এবং তার চিকিৎসা সুবিধার অপ্রতুলতাও প্রকট। দেশে অর্থবহ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় যৌনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমাদের দেশের গর্ভকালীন শিশু মৃত্যুর হার প্রায় ১৫০ গুণ^{৬৯}। সাধারণভাবে বাংলাদেশের শিশু স্বাস্থ্যের অবস্থাও খুব খারাপ।

প্রজননাধিকার সম্পর্কিত ধারণাটি বাংলাদেশে খুবই নতুন। সাধারণভাবে এ অধিকারের অর্থ হচ্ছে, নিজের শরীর ও প্রজননাচরণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা তা নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণভাবে নারীর। প্রজননাধিকার নিজের প্রজনন ক্ষমতার ওপর একজন নারীর ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। এ ধারণাকে আরো সম্প্রসারিত করে নারীর সামগ্রিক মনোস্তব্ধকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মহিলারা প্রায়শই ইস্যুটিকে অধিকতর স্পর্শকাতর করে তোলেন। এ ধারণাটিতে নারীর রাজনৈতিক শৃঙ্খল-মুক্তির প্রশ্নকে অন্তর্ভুক্ত করে না। পশ্চিমা সভ্যতার কৃষ্টি-লালিত নারীর মত বাংলাদেশের একজন নারীর কাছে "প্রজনন অধিকার" শব্দটি একই অর্থ বহন করে না।

বাংলাদেশের নারী-জীবন অপরের কর্তৃত্বাধীন। পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ, জাতি এমন কি দাতা সংস্থাসমূহও বাংলাদেশের নারীর প্রজননাধিকার ও প্রজননাচরণের ওপর তাদের স্ব-স্ব কর্তৃত্ব আরোপে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ষাটের দশক থেকে সরকার কর্তৃক ঘোষিত নীতি হচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। নারীর প্রজননাধিকারের ওপর বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক আরোপিত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সুতরাং প্রজননাধিকার বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রকদের একটি সুস্পষ্ট ছদ্মবেশ। এমন কি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে প্রজননাধিকার সম্পর্কিত বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, বিয়ের পর একজন নারীকে তার শরীর সম্পূর্ণরূপে তার স্বামীর বেদীতে সমর্পণ করতে হবে^{৭০}।

৪.১২ দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার প্রধান কারণ বিশ্লেষণ এবং তা নিরসনের উপায়সমূহ
জেভার ইস্যুসমূহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব। এছাড়া ধর্মীয় কুসংস্কার, প্রচলিত প্রথা, সামাজিক অনুশীলন, সচেতনতার অভাব এবং সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত। অনেকের মতে দারিদ্র দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

৬৯ Akhter, Halida Hanum (1994) : Concept Presentation and Related Issues on Reproductive Health. In : Jahan, Roushan et al ed. : Reproductive Rights and Women Health, Women for Women, Dhaka. p. 9.

৭০ Jahan, Roushan et al ed. : Reproductive Rights and Women Health, Women, Dhaka. p. 86.

কারণ। তাঁরা মনে করেন যে, প্রকৃত মানসিক বিকাশের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে দারিদ্র মানুষের সামর্থ্যকে নস্যাত্ন করে দেয়। ফলে প্রকৃত মানসিক বিকাশের অভাবে তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার উদ্ভব ঘটে। নারীর মুক্ত চলাফেরার প্রতি সমাজের অগ্রহণযোগ্যতা এবং জেভার ইস্যুসমূহের প্রতি পুরুষের সামগ্রিক মনস্তত্ত্ব বা অহংবোধ^{৭১} (ego) দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

তাঁদের মতে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী শিক্ষার জন্য বর্ধিষ্ণু সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে যথার্থ শিক্ষা বা বর্ধিত শিক্ষার হার অর্জন, জীবনের সর্বপরিসরে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ, স্বাধীনভাবে নিজের চাকুরি জীবন (career) বাছাইয়ের সুযোগ দানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনগত সহায়তাদান, উদ্বুদ্ধ-করণের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়ন ইত্যাদি জেভার-বৈষম্য দূরীকরণের অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচিত। উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিতকরণ, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, প্রণোদনা, মহিলাদের সম-জন্মাধিকার নিশ্চিতকরণ, আইনগত বৈষম্য দূরীকরণ এবং সামগ্রিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদিও এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

৫.০ নীতি-পরামর্শসমূহ ও উপসংহার

৫.১ নীতি-পরামর্শসমূহ

মানব সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে জেভার-ইস্যুসমূহের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশেও এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো এখনো গ্রন্থিল বা ঝামেলা-পূর্ণ। জেভার-ইস্যু সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে আমাদের সমাজকে এখনো অনেক পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের দেশে বিদ্যমান স্থূলকায় জেভার-বৈষম্য দূরীকরণে বর্তমান গবেষণায় বেশ কিছু পদক্ষেপ ও নীতি-সুপারিশ পরামর্শিত হয়েছে, যা সমস্যার উত্তরণে অনেক সহায়ক হবে। সুপারিশগুলো গবেষণার ফলাফল ও চিহ্নিত কৌশলগত দৃষ্টিকোণের আলোকে নিম্নরূপ পরামর্শিত হলো :

- * জেভার-ইস্যুসমূহ অধিকতর ভালভাবে বোঝার জন্য এবং সমাজ ও জাতির ওপর তার বহুমুখী ইতিবাচক প্রভাব সঞ্চালনে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ অত্যাৱশ্যক।
- * সমাজে বিদ্যমান জেভার-প্রাধান্য দূরীকরণে মহিলারা যাতে মা-বাবা, সন্তান ও পরিবারকে পুরুষের মত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম হয়

^{৭১} Here psychology or ego refers to one's negative mental make-up towards gender issues. In a patriarchal society like Bangladesh, there are many males who are not mentally ready to tolerate/accept women's superiority over them, even if a woman can prove herself to be superior than the males in a particular society.

তার জন্য উন্নয়নে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লাগসই আইনগত কাঠামো (appropriate legal framework) সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

- * জীবনের সকল পরিসরে নারীর অবদানকে আইনগতভাবে, সামাজিকভাবে এবং জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়া বাঞ্ছনীয়। উদ্বুদ্ধকরণ, প্রণোদনা ও উপদেশনার মাধ্যমে পুষ্টি-অবস্থান (nutritional status) পুনর্গঠনে একটি গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা অত্যাৱশ্যক।
- * দেশের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় পুষ্টি-শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- * নারীর অবস্থানের পূর্ণ অগ্রগতি সাধনে এবং উন্নয়নে শিক্ষাকে তাদের মৌলিক অস্ত্র (basic tool) হিসেবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।
- * স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে জেডার-বৈষম্য সৃষ্টি সামাজিক এবং আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে নারীর প্রতি বিনামূল্যে অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে।
- * চিকিৎসা, শিক্ষকতা, নার্সিং, ডে-কেয়ার সার্ভিসেস, সাচিবিক কর্ম, তথ্য প্রযুক্তিসহ কম্পিউটার, টেলিফোন অপারেটিং, ব্যাংকিং ইত্যাদির মত কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নারীর চাকুরি সুবিধা প্রদানে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া উচিত। এ সকল ক্ষেত্রে তাদের উন্নয়নের জন্যও পর্যাপ্ত এবং যথার্থ সুবিধা সম্প্রসারণ করা বাঞ্ছনীয়।
- * কর্মজীবী মহিলাদের কর্মস্থলে অধিকতর নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে কোন ধরনের হয়রানি বা উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অধিকতর নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- * পারিবারিক ও কর্ম-অবস্থানে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের অধিকতর স্বাধীনতা সম্প্রসারণ করা উচিত।
- * সমাজে বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নে এবং উন্নয়ন ও জাতি গঠন কার্যক্রমে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে দেশে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণীত এবং অনুসৃত হওয়া দরকার।
- * দেশের বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় এবং অন্যান্য পর্যায়ের রাজনীতিতে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসৃত হওয়া

বাঞ্ছনীয়, যার মাধ্যমে তাদের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংস্থানকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনের মত অধিকতর নিরাপদ পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব।

- * "নারীর ক্ষমতায়ন"কে জেভার-ইস্যুর একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় নয়। এটিকে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইনগত ইস্যুর সাথে সমন্বিত একটি প্যাকেজ-বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।
- * জাতীয় কৌশলগত কার্যক্রম পরিকল্পনায় প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাসমূহকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধ পদ্ধতির পরিবর্তন আনয়নে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- * দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, মানব ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যতের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, প্রণোদনা ও পরামর্শ প্রদান (counseling) জেভার-বৈষম্য দূরীকরণের মৌলিক কৌশল হিসেবে অনুসৃত হওয়া উচিত।
- * বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, নার্সিং, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান বা সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি বিশেষ প্রাধান্য সম্প্রসারণ করা বাঞ্ছনীয়।
- * কর্ম-পরিবেশে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণে মহিলাদেরকে উৎসাহিত করা উচিত। এ ধরনের উৎসাহ প্রদান তাদের সামর্থ্যের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটাবে।
- * সরকার জনসংখ্যা নীতির পরিবর্তন না আনা পর্যন্ত প্রজননাদিকার সম্পর্কিত বিষয়াদি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবস্থাপিত হওয়া উচিত। নিবিড় উদ্বুদ্ধকরণ (motivation), সচেতনতা বৃদ্ধি (conscientization), ওকালতি (advocacy) ও পরামর্শ প্রদান (counseling) এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৫.২ উপসংহার

জেভার-ইস্যুসমূহ আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা ধারণ করে। একারণে তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত ও রাজনৈতিকভাবে সম্বোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জেভার-সমতা, সহমর্মিতা ও সাম্য নিশ্চিতকরণে সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য এজেন্ট হিসেবে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁদেরকে এবং যাঁরা নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি

জেভার-বন্ধুসুলভ হওয়া দরকার। জেভার-সমস্যাগুলো মূলত সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ব্যাপ্ত, যেখানে শিক্ষার অভাব খুবই প্রকট; ধর্মীয় কুসংস্কার এখনো সমাজের রক্ত্রে রক্ত্রে গভীরভাবে প্রোথিত; সাংস্কৃতিক অন্ধ-বিশ্বাসগুলো জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে আছে এবং দারিদ্র যেখানে মানুষের দোর-গোড়ায় কঠোরভাবে হানা দিয়েছে। একারণে পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ এবং জাতি সকল পর্যায়ে এ সমস্যাগুলোকে একান্ত নিজস্ব সমস্যা মনে করে সংশ্লিষ্ট পরিসরে ফলপ্রসূ উদ্ধৃদ্ধকরণ, প্রণোদনা ও আত্মপোলকির জাগরণী কৌশল (conscientization strategies) গ্রহণের প্রয়োজন।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (1998): Towards Gender Equity : Poverty, Rights and Participation. CIRDAP, Dhaka.

Halder, Nilratan : Women in the Army : A Big Breakthrough in Gender Equity. Observer Magazine, Friday, July 28, 2000, Dhaka, 2000.

Rahman, M. Safiur and Imam, Kazi Hasan (1993) : Need Assessment of Population Training for the participants of the Foundation Training Course. BPATC, Savar, Dhaka.

Singh, Karan (1992). : Population, the Forgotten Factors. In : The Indian Journal of Public Administration, IIPA, Vol. XXXVIII, No. 3, July-Sept., 1992.

The Government of the People's Republic of Bangladesh : Bangladesh Constitution. Dhaka, p. 8. Part-III.

The Government of the People's Republic of Bangladesh (1998) : The Fifth Five Year Plan 1997-2002. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka.

বিঃ দ্রঃ গ্রন্থটির নির্বাচিত মূল্যায়নকারীর উপদেশনার আলোকে পাদটীকায় প্রদর্শিত পুস্তক/প্রকাশনা নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।